بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২২ জানুয়ারি ২০২১ মোতাবেক ২২ সুলাহ্, ১৪০০ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাআব্বুয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন,

আজ হযরত উসমান (রা.)'র স্মৃতিচারণ শুরু করব এবং আগামী কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। হযরত উসমান (রা.)'র বিষয়ে প্রথম যে কথাটি স্মরণ রাখতে হবে তা হল, তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি। এতদসত্ত্বেও তিনি সেই আটজন সৌভাগ্যবান সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদেরকে মহানবী (সা.) বদরের যুদ্ধের মালে গণিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে অংশ প্রদান করে পক্ষান্তরে তাঁদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন।

তাঁর নাম হযরত উসমান বিন আফ্ফান বিন আবুল আস বিন উমাইয়াহ্ বিন আবদে শামস বিন আবদে মানাফ বিন কুসায় বিন কিলাব। এভাবে তাঁর বংশধারা ৫ম পুরুষ আবদে মানাফে গিয়ে মহানবী (সা.)-এর বংশধারায় মিলে যায়। হযরত উসমান (রা.)'র মায়ের নাম ছিল আরওয়া বিনতে কুরায়েয। তাঁর নানী হলেন, উম্মে হাকীম বায়যা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব- যিনি ছিলেন মহানবী (সা.)-এর পিতা হযরত আব্দুল্লাহ্'র আপন সহোদরা। এক বর্ণনা অনুসারে মহানবী (সা.)-এর পিতা হযরত আব্দুল্লাহ্ এবং হযরত উসমান (রা.)'র নানী উম্মে হাকীম বায়যা বিনতে আব্দুল মুত্তালিব জমজ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হযরত উসমান (রা.)'র মাতা আরওয়া বিনতে কুরায়েয হুদায়বিয়ার সন্ধির পর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় চলে আসেন আর নিজ পুত্র হযরত উসমান (রা.)'র খিলাফতকালে আমৃত্যু মদীনাতেই অবস্থান করেন। হযরত উসমান (রা.)'র পিতা জাহিলিয়্যাতের যুগেই মারা গিয়েছিলেন। **{আল্ ইসাবাহ্ ফী তামীযিস্ সাহাবাহ্ লি-ইমাম হাজর আসকালানী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৭৭, উসমান বিন আফ্ফান (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৫ সালে প্রকাশিত}, (আলী মুহাম্মদ আল্ সালাবী প্রণীত সীরাত আমীরুল মু'মিনীন উসমান বিন আফ্ফান শাখসিয়্যাতুহু ওয়া আসরুহু, পৃ: ১৫, প্রথম অধ্যায়, ইসমুহু ওয়া নাসাবুহু ওয়া কুনিয়াতুহু, বৈরুতের দারুল মা'রেফাহ্ থেকে ২০০৬ সালে প্রকাশিত), (সীরুস্ সাহাবাহ্, ১ম খণ্ড,পৃ: ১৫৪, করাচীর দারুল এশায়াত কর্তৃক ২০০৪ সালে প্রকাশিত), (আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১৮২-১৮৩, আরওয়া বিনতে কুরায়য, উম্মে কুমসূম বিন আকাবাহ্)**

হযরত উসমান (রা.)'র ডাকনাম নামের ব্যাপারে বলা হয়, অজ্ঞতার যুগে তার ডাকনাম ছিল আবু আমর। যখন রসুল (সা.)-এর কন্যা হযরত রুকাইয়ার গর্ভে তাঁর সন্তান আব্দুল্লাহ্র জন্ম হয় তখন এর সূত্র ধরে মুসলমানদের মাঝে তাঁর ডাক নাম 'আবু আব্দুল্লাহ্' প্রসিদ্ধি লাভ করে। **(আলী মুহাম্মদ আল্ সালাবী প্রণীত সীরাত আমীরুল মু'মিনীন উসমান বিন আফ্ফান শাখসিয়্যাতুহু ওয়া আসরুহু, পৃ: ১৫, প্রথম অধ্যায়, ইসমুহু ওয়া নাসাবুহু ওয়া কুনিয়াতুহু, বৈরুতের দারুল মা'রেফাহ্ থেকে ২০০৬ সালে প্রকাশিত)**

ইবনে ইসহাকের মতে মহানবী (সা.) তাঁর কন্যা হযরত রুকাইয়্যা (রা.)-কে হযরত উসমান (রা.)'র কাছে বিয়ে দেন- যিনি বদরের যুদ্ধের সময় মৃত্যুবরণ করেন। তখন মহানবী (সা.) তাঁর দ্বিতীয়া কন্যা হযরত রুকাইয়্যা (রা.)'র সহোদরা হযরত উম্মে কুলসুম (রা.)-কে হযরত উসমান (রা.)'র কাছে বিয়ে দেন। এ কারণেই তাঁকে যুন্নুরাইন বলা হয়। **{আল্ ইসাবাহ্ ফী তামীযিস্ সাহাবাহ্ লি-ইমাম হাজর আসকালানী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৭৭, উসমান বিন আফ্ফান (রা.), বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৫ সালে প্রকাশিত},**

এটিও বর্ণিত হয়েছে, তাঁকে যুন্নুরাইন এ কারণে বলা হতো যে, তিনি (রা.) প্রতি রাতে তাহাজ্জুদের নামাযে অনেক বেশি পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন। যেহেতু কুরআন হল, নূর এবং রাতে দণ্ডায়মান হওয়া তথা তাহাজ্জুদও এক প্রকার নূর বিশেষ, তাই তিনি যুন্নুরাইন তথা 'দুই নূরের' উপাধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। **(আলী মুহাম্মদ আল্ সালাবী প্রণীত সীরাত আমীরুল মু'মিনীন উসমান বিন আফ্ফান শাখসিয়্যাতুহু ওয়া আসরুহু, পৃ: ১৬, প্রথম অধ্যায়, ইসমুহু ওয়া নাসাবুহু ওয়া কুনিয়াতুহু, বৈরুতের দারুল মা'রেফাহ্ থেকে ২০০৬ সালে প্রকাশিত)**

একটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনানুসারে মক্কায় হযরত উসমান (রা.)'র জন্ম হয়েছে 'আমুল ফীল' (অর্থাৎ মক্কার উপকণ্ঠে আবরাহা বাহিনীর ধ্বংস হওয়ার) ছয় বছর পর। আর এটিও বলা হয়েছে, তিনি তায়েফে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর চেয়ে প্রায় পাঁচ বছর ছোট ছিলেন। **(আলী মুহাম্মদ আল্ সালাবী প্রণীত সীরাত আমীরুল মু'মিনীন উসমান বিন আফ্ফান শাখসিয়্যাতুহু ওয়া আসরুহু, পৃঃ ১৬, প্রথম অধ্যায়, ইসমুহু ওয়া নাসাবুহু ওয়া কুনিয়াতুহু, বৈরুতের দারুল মা'রেফাহ্ থেকে ২০০৬ সালে প্রকাশিত)**

তাঁর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে ইয়াযীদ বিন রূমান বর্ণনা করেন, একবার হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) এবং হযরত তালহা বিন উবায়দুল্লাহ্ (রা.), দু'জনেই হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)'র পিছু নেন এবং মহানবী (সা.)-এর সকাশে গিয়ে উপস্থিত হন। তিনি (সা.) তাদের উভয়ের কাছে ইসলামের বাণী উপস্থাপন করেন এবং তাদেরকে পবিত্র কুরআন পাঠ করে শোনান এবং তাদেরকে ইসলামের অধিকার সমূহ্ সম্পর্কে অবহিত করেন। আর তাদেরকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ভবিষ্যতে লাভ হবে এমন সম্মান ও মর্যাদার (বিষয়ে) প্রতিশ্রুতি দেন। তখন তারা উভয়ে তথা হযরত উসমান (রা.) এবং হযরত তালহা (রা.) ঈমান আনেন এবং তাঁর সত্যায়ন করেন। হযরত উসমান (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! সম্প্রতি আমি সিরিয়া থেকে ফিরেছি। যখন আমরা **মা'আন** এবং **যারকা** নামক স্থানের মাঝে শিবির স্থাপন করেছিলাম, {মা'আন হল জর্ডানের দক্ষিণে হিজাযের সীমান্তবর্তী একটি শহর আর যারকা মা'আনের পাশেই অবস্থিত একটি জায়গা যাহোক তিনি (রা.) বলেন,} সেখানে আমরা শিবির স্থাপন করেছিলাম আর আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম, তখন এক ঘোষক এই ঘোষণা দেয়, হে ঘুমন্তরা! জাগ্রত হও, নিশ্চয় মক্কায় আহমদ আবির্ভূত হয়েছেন। ফিরে আসার পর আমরা আপনার (দাবীর) কথা শুনি। হযরত উসমান (রা.) মহানবী (সা.)-এর দ্বারে আরকামে প্রবেশের পূর্বেই প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন ছিলেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩১, উসমান বিন আফ্ফান (রা.), বৈরুতের দারুল এহইয়াউত্ তারাসুল আরবী থেকে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত}, (ডক্তর গোলাম জীলানী বরক প্রণীত মু'জামুল বুলদান পৃঃ ৩২০, মু'জামুল বুলদান, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৭২, আয্যারকা, বৈরুতের দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্ থেকে প্রকাশিত)**

ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর ওপর নির্যাতনও চালানো হয়। মূসা বিন মোহাম্মদ তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তার চাচা হাকাম বিন আবুল আস বিন উমাইয়্যাহ্ তাঁকে ধরে রশি দিয়ে বেঁধে ফেলে এবং বলে তুমি কি নিজের পৈত্রিক ধর্ম পরিত্যাগ করে নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছ? খোদার কসম! এই নতুন ধর্ম পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত আমি তোমাকে ছাড়বো না। তখন হযরত উসমান (রা.) বলেন খোদার কসম! আমি এটি কখনও পরিত্যাগ করবো না আর এটি থেকে কখনও পৃথকও হব না। তাঁর ইসলামের ওপর দৃঢ়তা দেখে বাধ্য হয়ে হাকাম তাঁকে ছেড়ে দেয়। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩১, উসমান বিন আফ্ফান (রা.), বৈরুতের দারুল এহইয়াউত্ তারাসুল আরবী থেকে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত}**

হযরত রুকাইয়্যা (রা.)'র সাথে তাঁর বিয়ের ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহানবী (সা.)-এর নবুয়্যতের দাবীর পূর্বে হযরত রুকাইয়্যা (রা.)'র সম্পর্ক হয়েছিল আবু লাহাবের পুত্র উতবাহ্ এবং তার বোন উম্মে কুলসুম (রা.)'র সম্পর্ক হয়েছিল উতবাহ্র ভাই উতাইবাহ্'র সাথে। যখন 'সূরাতুল মাসাদ' অর্থাৎ 'সূরা আল্ লাহাব' অবতীর্ণ হয় তখন তাদের পিতা আবু লাহাব তাদেরকে বলে, তোমরা উভয়ে যদি মোহাম্মদ (সা.)- এর কন্যাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না কর তাহলে তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। (তাদের সাথে) সম্পর্কচ্ছেদ কর। তখন তারা উভয়েই রুখসাতানার পূর্বেই উভয় বোনকে তালাক দিয়ে দেয়। এরপর হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রা.) মক্কাতেই হযরত রুকাইয়্যা (রা.)-কে বিয়ে করেন এবং তার সঙ্গে আবিসিনিয়া অভিমুখে হিজরত করেন। হযরত রুকাইয়্যা এবং হযরত উসমান (রা.) উভয়ই নিজেদের সৌন্দর্যে ছিলেন অনন্য। যেমন কথিত আছে, **'আহ্সানা যওজাইনে রাআহুমা ইনসানুন রুকাইয়্যাতু ও যওজুহা উসমানা'** অর্থাৎ কোন মানুষের দেখা সবচেয়ে সুন্দর দম্পতি

হল, হযরত রুকাইয়্যা (রা.) এবং তাঁর স্বামী হযরত উসমান (রা.)। **(শরাহ্ আল্লামাহ্ যুরকানী, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩২২-৩২৩, বাব ফী যিকরু আওলাদাহুল কিরাম, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত)**

আব্দুর রহমান বিন উসমান কুরাশী কর্তৃক বর্ণিত যে, মহানবী (সা.) একদা তাঁর মেয়ের বাড়ীতে যান। তিনি তখন হযরত উসমান (রা.)-র মাথা ধুয়ে দিচ্ছিলেন, এই দৃশ্য দেখে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, **'হে আমার কন্যা! তুমি আবু আব্দুল্লাহ্র সাথে উত্তম আচরণ করতে থাকো, নিশ্চয় সে চারিত্রিক দিক থেকে আমার সাহাবীদের মধ্য থেকে আমার সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য রাখে।'** **(আল্ মু'জামুল কবীর লিত্ তিবরানী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৬, হাসীস নংঃ ৯৮, দারুল এহইয়াউত্ তারাসুল আরাবী থেকে ২০০২ সাথে প্রকাশিত)**

হিজরতের ঘটনা সম্পর্কে ইবনে ইসহাক বলেন, মহানবী (সা.) যখন দেখেন, তাঁর সাহাবীরা পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছেন আর আল্লাহ্ তা'লার সাথে তাঁর সম্পর্ক ও পদমর্যাদার কারণে এবং নিজ চাচা আবু তালেবের সুবাদে তিনি (সা.) নিরাপদ ছিলেন। অর্থাৎ তিনি (সা.) কিছুটা নিরাপদে থাকলেও সাহাবীদের ওপর যে নির্যাতন হচ্ছিল তা প্রতিহত করার কোন শক্তি-সামর্থ্য তাঁর ছিল না। (মোটকথা, তিনি স্বয়ং কিছুটা হলেও নিরাপদে ছিলেন কিন্তু সাহাবীদের ওপর যে অত্যাচার হচ্ছিল, সেই অত্যাচার প্রতিহত করার শক্তি তাঁর ছিল না। তাই তিনি (সা.) সাহাবীদের বলেন, 'তোমরা যদি হাবশা বা আবিসিনিয়া চলে যাও তাহলে সেখানে এমন একজন বাদশাহ্ পাবে যার রাজত্বে কারো প্রতি অত্যাচার-নির্যাতন করা হয় না, আর সেই রাজত্ব হচ্ছে সত্যের আবাসস্থল। (তোমরা সেখানে অবস্থান কর) যতদিন না আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে নিপতিত এই পরীক্ষা থেকে মুক্তি দেন।' তখন মহানবী (স.)-এর সাহাবীগণ নৈরাজ্যের ভয়ে এবং স্বীয় ধর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার পানে প্রত্যাবর্তনের খাতিরে মহানবী (সা.)-কে ছেড়ে আবিসিনিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। এটি ইসলামের ইতিহাসের প্রথম হিজরত ছিল।

হযরত উসমান (রা.) তাঁর স্ত্রী রসূল-তনয়া হযরত রুকাইয়্যা (রা.) সহ আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। **(আস্ সীরাতুন নবুবিয়্যাহ্ লি-ইবনে হিশাম, পৃঃ ২৩৭-২৩৮, বাবু যিকরিল হিজরাহ্ আল্ উলা ইলা আরযিল হাবাশাহ্, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত)**

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উসমান (রা.) আবিসিনিয়া অভিমুখে হিজরতের জন্য বের হলে তাঁর সাথে হযরত রুকাইয়্যা বিনতে রসূলুল্লাহ্ (সা.)ও ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর কাছে তাদের সংবাদ পৌঁছতে বিলম্ব হয়। এটি জানা যাচ্ছিল না যে, তারা হিজরত করে কোথায় পৌঁছেছেন, এবং কী অবস্থায় আছেন? তিনি (রা.) বাইরে এসে তাদের সংবাদের জন্য অপেক্ষায় থাকতেন। এরপর একজন মহিলা এসে তাদের সম্পর্কে তাঁকে (সা.) অবগত করে। সব শুনে তিনি (সা.) বলেন, হযরত লূত (আ.)-এর পর উসমান সেই প্রথম ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর সাথে আল্লাহ্র রাস্তায় হিজরত করেছে। **(মজমাউয্ যওয়ায়েদ ওয়া মিমবাউল ফওয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৫৮, কিতাবুল মানাকেব, বাব হিজরাতুহু, হাদীস নংঃ ১৪৪৯৮, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত)**

হযরত সা'দ (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রা.) যখন আবিসিনিয়া অভিমুখে হিজরতের সংকল্প করেন তখন মহানবী (সা.) তাকে বলেন, রুকাইয়্যাকেও সাথে নিয়ে যাও। আমার ধারণা তোমাদের একজন আরেকজনের মনোবল যোগাবে। অর্থাৎ দু'জন একসাথে থাকলে একে অন্যের মনোবল বৃদ্ধি করতে থাকবে। অতঃপর মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র কন্যা আসমাকে বলেন, যাও তাদের উভয়ের সংবাদ নিয়ে এসো। অর্থাৎ তারা বেরিয়ে গেছে, কোথায় পৌঁছেছে, বাইরের অবস্থা কীরূপ? হযরত আসমা (রা.) যখন ফেরত আসেন তখন হযরত আবু বকর (রা.)ও মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, হযরত উসমান (রা.) একটি খচ্চরে পালান বেঁধে তাতে হযরত রুকাইয়্যা (রা.)-কে আরোহণ করিন সমুদ্র অভিমুখে যাত্রা করেছেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, হে আবু বকর! হযরত লূত (আ.) ও হযরত ইবরাহীম (আ.)'র পর এ দু'জন হিজরতকারীদের মধ্যে

সর্বপ্রথম হিজরতকারী। {মুসতাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪১৪, কিতাব মা'রেফাতিস্ সাহাবাহ্, বাব যিকরু রুকাইয়্যাহ্ বিনতে রসুলুল্লাহ্ (সা.). হাদীস নংঃ ৬৯৯৯. বৈরুতের দারুল ফিক্‌র থেকে ২০০২ সালে প্রকাশিত}

এরপর আবিসিনিয়া থেকে তার ফেরত আসার ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে। ইবনে ইসহাক বলেন, মহানবী (সা.) এর যেসব সাহাবী আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন তারা সংবাদ পান যে, মক্কাবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। তখন এই মুহাজিরগণ আবিসিনিয়া থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে ফিরে আসেন। মক্কার কাছাকাছি পৌঁছলে তারা জানতে পারেন, উক্ত সংবাদ ভুল ছিল। তখন তারা গোপনে বা কারো নিরাপত্তায় মক্কায় প্রবেশ করেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন এমন ছিলেন যারা এরপর মদীনায় হিজরত করেন এবং বদর ও উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। আর তাদের মধ্যে কয়েকজনকে কাফিররা মক্কায় থাকতে বাধ্য করে এবং তারা বদর ও অন্যান্য যুদ্ধে অংশ নিতে পারেন নি। আবিসিনিয়া থেকে ফিরে এসে পুনরায় মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকারীদের মধ্যে হযরত উসমান (রা.) এবং তার স্ত্রী হযরত রুকাইয়্যা বিনতে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (আস্ সীরাতুন নবুবিয়্যাহ্ লি-ইবনে হিশাম, পৃঃ ২৬৫-২৬৬, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০১ সালে প্রকাশিত)

হযরত উসমান (রা.) আবিসিনিয়াতে কয়েক বছর থাকেন। একটি গ্রন্থের একস্থানে একথা লেখা আছে যে, (তিনি) সেখানে কয়েক বছর অবস্থান করেছেন। এরপর যখন কতিপয় সাহাবী কুরাইশদের ইসলাম গ্রহণের ভুল সংবাদ শুনে স্বদেশে ফেরত আসেন তখন হযরত উসমান (রা.)ও (ফিরে আসেন)। এখানে ফিরে এসে জানা যায় এ সংবাদ মিথ্যা। এ প্রেক্ষিতে কতিপয় সাহাবী পুনরায় আবিসিনিয়ায় ফিরে গেলেও হযরত উসমান (রা.) মক্কাতেই অবস্থান করেন। এরইমধ্যে মদীনা অভিমুখে হিজরত করার সুযোগ সৃষ্টি হয় আর মহানবী (সা.) তাঁর সব সাহাবীকে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দেন। তখন হযরত উসমান (রা.)ও তাঁর পরিবারবর্গের সাথে মদীনায় গমন করেন। {সীরুস্ সাহাবাহ্, ১ম খণ্ড, (খোলাফায়ে রাশেদীন) পৃঃ ১৭৮, লাহোরের ইলসামীয়্যাত আনারকলি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত)

একটি বর্ণনায় এ-ও উল্লেখ পাওয়া যায় যে, হযরত উসমান (রা.) দ্বিতীয়বার আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। {আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩১, উসমান বিন আফ্‌ফান (রা.), বৈরুতের দারুল এহইয়াউত্ তারাসুল আরবী থেকে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত} কিন্তু অধিকাংশ জীবনী গ্রন্থে হযরত উসমান (রা.)'র আবিসিনিয়ায় এই দ্বিতীয় হিজরতের উল্লেখ নেই। এমনিতেও আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরতের যে পটভূমি ও বিবরণ সীরাত ও হাদীস-গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত হয়েছে, তা সতর্কতা অবলম্বনকারী ইতিহাসবীদরা হুবহু সেভাবে গ্রহণ করেন না কারণ ঘটনার ধারাবাহিকতায় এমনটি ঘটা অসম্ভব ছিল। যেমন আবিসিনিয়ার হিজরত সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) সাহেব (রা.) নিজের গবেষণা কর্ম তুলে ধরেছেন, যদিও আমি এর কিছু অংশ পূর্বে অন্যান্য সাহাবীর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বর্ণনা করেছি, কিন্তু এখানেও এর উল্লেখ করা আবশ্যক। মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)'র গবেষণা হল, তিনি (রা.) বর্ণনা করেন, "মুসলমানদের কষ্ট যখন চরম সীমায় উপনীত হয় এবং কুরাইশরা তাদের অত্যাচারে ক্রমাগত বাড়তে থাকে তখন মহানবী (সা.) মুসলমানদের বলেন, তারা যেন হিজরত করে আবিসিনিয়ায় চলে যান। তিনি (সা.) আরও বলেন, আবিসিনিয়ার বাদশাহ্ একজন আদাল ও ন্যায়বিচারক। তার সাম্রাজ্যে কারো প্রতি অবিচার করা হয় না। আবিসিনিয়া দেশটি যেটিকে ইংরেজিতে ইথিওপিয়া বা আবিসিনিয়া বলা হয়। এটি আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত এবং ভৌগলিক দিক থেকে এটি দক্ষিণ আরবের একেবারে বিপরীতে অবস্থিত। এই দু'টির মাঝে লোহিত সাগর ছাড়া আর কোন দেশ নেই। সেই যুগে আবিসিনিয়ায় একটি শক্তিশালী খ্রিস্টান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সেখানকার শাসকের উপাধি ছিল নাজ্জাশী। আজও {অর্থাৎ যখন হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন তখনও} সেখানকার শাসক এই উপাধিতেই সম্বোধিত হন। আবিসিনিয়ার সাথে আরবের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল এবং সেই যুগে আবিসিনিয়ার রাজধানী ছিল আকসুম (Axsum) যেটি বর্তমানের আদোয়া (Adowa) শহরের কাছে অবস্থিত। এটি এখন পর্যন্ত একটি পবিত্র নগরী হিসেবে সমাদ্রিত। আকসুম সেই যুগে একটি শক্তিশালী

সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল আর **তখনকার বাদশা নাজ্জাশীর ব্যক্তিগত নাম ছিল আসহামাহা**, যিনি একজন ন্যায়পরায়ণ, বিচক্ষণ এবং সুপ্রতিষ্ঠিত বাদশা ছিলেন। মোটকথা মুসলমানদের কষ্ট যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন মহানবী (সা.) তাদেরকে উপদেশ দিয়ে বলেন, যাদের পক্ষে সম্ভব, তারা যেন আবিসিনিয়ায় হিজরত করে। অতএব মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে নবুয়্যতের ৫ম বছর রজব মাসে এগারোজন পুরুষ এবং চারজন মহিলা আবিসিনিয়ার উদ্দেশ্যে হিজরত করেন। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম হল, হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) এবং তাঁর সহধর্মিণী মহানবী (সা.)-এর কন্যা হযরত রুকাইয়্যা (রা.), হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.), হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.), হযরত আবু হুযায়ফাহা বিন উতবাহ্ (রা.), উসমান বিন মাযঊন (রা.), মুসআব বিন উমায়ের (রা.), আবু সালামাহ্ বিন আব্দুল আসাদ এবং তাঁর সহধর্মিণী উম্মে সালামাহ্ (রা.)। মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এখানে লিখেন, এটি এক অদ্ভূত বিষয়, প্রাথমিক যুগের এই মুহাজিরদের অধিকাংশই কুরাইশদের শক্তিশালী গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতের আর দুর্বল লোক খুব কমই দেখা যায়। এটি থেকে দু'টি বিষয় জানা যায়; প্রথমত, শক্তিশালী গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত মুসলমানরাও কুরাইশদের অত্যাচার থেকে নিরাপদ ছিল না। দ্বিতীয়ত, দুর্বল প্রকৃতির মানুষ যেমন দাস প্রভৃতি সেই সময় এমন নিরূপায় এবং অসহায় ছিল যে, (তারা) হিজরত করার সামর্থ্যও রাখত না।

এসব মুহাজির যখন দক্ষিণ দিকে সফর করে শুয়ায়বাহ্ পৌঁছে যা সে যুগে আরবের একটি সমুদ্রবন্দর ছিল তখন আল্লাহ্ তা'লার এমন কৃপা হয় যে, তারা একটি বাণিজ্যিক জাহাজ পেয়ে যায় যেটি ইথিওপিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল। অতএব তারা সবাই নিরাপদে সেই জাহাজে আরোহণ করেন এবং জাহাজ রওয়ানা হয়ে যায়। মক্কার কুরাইশরা তাদের হিজরতের খবর পেয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয় যে, শিকার এত সহজে আমাদের হাত ছাড়া হয়ে গেল! এরপর তারা সেসব মুহাজিরদের পিছু ধাওয়া করে, কিন্তু তাদের লোকজন যখন সমুদ্রতীরে পৌঁছে ততক্ষণে জাহাজ ছেড়ে দিয়েছিল। তাই তারা ব্যর্থ ও বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসে। ইথিওপিয়ায় পৌঁছে মুসলমানরা খুবই নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ জীবন লাভ করে এবং আল্লাহ্‌র কৃপায় কোনভাবে কুরাইশদের অত্যাচার নিপীড়ন থেকে মুক্তি পায়। কিন্তু যেমনটি অনেক ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন, মুহাজিরদের ইথিওপিয়ায় যাওয়ার তখনো বেশিদিন পার হয় নি, তাদের কাছে একটি উড়ো সংবাদ পৌঁছে যে, কুরাইশরা মুসলমান হয়ে গেছে আর মক্কায় এখন পুরোপুরি শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করছে। এই সংবাদের ফলাফল যা দাঁড়ায় তা হল, অধিকাংশ মুহাজির চিন্তাভাবনা না করেই (মক্কায়) ফিরে আসে। এরা যখন মক্কার কাছাকাছি (এসে) পৌঁছে তখন জানতে পারে, সংবাদটি ছিল ভিত্তিহীন। এমতাবস্থায় তারা ছিলেন কঠিন বিপদের সম্মুখীন। অবশেষে অনেকে রাস্তা থেকেই ফিরে যায় আবার অনেকে চুপিসারে বা কোন প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবান ব্যক্তির নিরাপত্তায় মক্কায় চলে আসেন। এটি ৫ম নববীর শওয়াল মাসের ঘটনা অর্থাৎ হিজরতের সূচনা ও মুহাজিরদের ফিরে আসার মাঝে কেবল আড়াই তিন মাসের ব্যবধান।

যদিও সত্যিকার অর্থে এই গুজব একেবারেই মিথ্যা ও অমূলক ছিল, যা ইথিওপিয়ায় হিজরতকারীদের ফিরিয়ে আনতে এবং তাদেরকে কষ্টে নিপতিত করার উদ্দেশ্যে কুরাইশরা (হয়তো) ছড়িয়ে থাকবে। বরং গভীর অভিনিবেশ বুঝা যায়, এই গুজব এবং মুহাজিরদের ফিরে আসার কাহিনীই ভিত্তিহীন। তবে, যদি এটিকে সঠিক বলে ধরে নেয়া হয় তাহলে হতে পারে, এর নেপথ্যে সেই ঘটনাটি রয়েছে যার উল্লেখ বিভিন্ন হাদীসে রয়েছে। (যদি বিষয়টি এভাবে দেখা হয় অর্থাৎ, কারো কারো যে বর্ণনা রয়েছে, হযরত উসমান (রা.) সেখানে কয়েক বছর অবস্থান করেছিলেন- এটি যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে সেটি ভুল প্রমাণিত হয়। আর যদি এটিকে ভুল মনে করা হয় তাহলে তিন বা চার মাসের মধ্যেই (তারা) ফিরে এসে থাকবেন। যাহোক, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)'র গবেষণার ফলাফল হল, এই ঘটনাটি অমূলকই ছিল। তিনি (রা.) লিখেন, "এটিকে যদি সঠিক মনে করা হয় তাহলে হতে পারে এর নেপথ্যে সেই ঘটনাটি রয়েছে যা কোন কোন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আর এটি বুখারী শরীফে এভাবে

বর্ণিত হয়েছে যে, একবার মহানবী (সা.) কাবা চত্বরে সূরা নজমের বিভিন্ন আয়াত তিলাওয়াত করেন। তখন সেখানে কাফিরদের বেশ কয়েকজন নেতাও উপস্থিত ছিল আর কতিপয় মুসলমানও ছিলেন। তিনি (সা.) সূরা নজমের আয়াতসমূহ তিলাওয়াত শেষে সিজদা করেন আর তাঁর সাথে উপস্থিত মুসলমান ও কাফির সবাই সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। (যাহোক,) কাফিররা কেন সিজদা করেছিল– এর কারণ হাদীসে উল্লেখ নেই। কিন্তু মনে হয়, মহানবী (সা.) যখন অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী কণ্ঠে কুরআনের আয়াতসমূহ পাঠ করেন আর এসব আয়াতে বিশেষভাবে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ, তাঁর ক্ষমতা ও প্রতাপের অতীব উচ্চাঙ্গীন ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় চিত্রাঙ্কন করা হয়েছিল এবং তাঁর অনুগ্রহরাজি স্মরণ করানো হয়েছিল আর এক প্রতাপান্বিত ও মহিমান্বিত ভাষায় কুরাইশদের সতর্ক করা হয়েছিল যে, তারা যদি নিজেদের দুষ্কৃতি হতে নিবৃত্ত না হয় তাহলে তাদের পরিণতিও তাদের পূর্ববর্তী সেসব জাতির ন্যায় হবে যারা খোদার রসূলদের মিথ্যাবাদী বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল। আর সবশেষে এসব আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, আস আর আল্লাহর সমীপে সিজদায় পতিত হও। এই আয়াতগুলো পাঠ করার পর মহানবী (সা.) এবং উপস্থিত সকল মুসলমান একযোগে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। এই বাণী ও এই দৃশ্যের এমন জাদুকরি প্রভাব কুরাইশদের ওপর পড়ে যে, তারাও অবলীলায় মুসলমানদের সাথে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। আর এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, এমন উপলক্ষ্যে এমন পরিস্থিতিতে... প্রায় সময় মানুষের হৃদয় ত্রস্ত হয়ে যায় আর অবলীলায় সে এমন কাজ করে বসে যা তার নীতি ও ধর্ম পরিপন্থী হয়ে থাকে। (মানার কারণেই এমনটি করবে– তা আবশ্যক নয়। অনেক সময় অনিচ্ছাসত্ত্বেও (মানুষ) কিছু কাজ করে বসে।) কোন কোন সময় এক চরম ও আকস্মিক বিপদের সময় একজন নাস্তিকও আল্লাহ্ আল্লাহ্ বা রাম রাম বলে ওঠে। (আমিও কোন কোন নাস্তিককে জিজ্ঞেস করেছি, তারা বলে– একথা একেবারে সঠিক। খোদার প্রতি আমাদের বিশ্বাস না থাকা সত্ত্বেও যদি কোন ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখা দেয় তখন অবলীলায় মুখ থেকে 'খোদা' শব্দ নির্গত হয়। যাহোক,) কুরাইশরা তো নাস্তিক ছিল না বরং তারা খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল। অতএব, এই প্রতাপী ও বলিষ্ঠ বাণী পাঠের পর মুসলমানরা যখন একসাথে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে তখন এর এমন জাদুকরি প্রভাব পড়ে যে, তাদের সাথে কুরাইশরাও অবলীলায় সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। কিন্তু এমন প্রভাব সাধারণত সাময়িক হয়ে থাকে এবং মানুষ স্বল্পক্ষণের মাঝেই নিজের আসল অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। অতএব, এখানেও এমনটিই হয়েছে আর সিজদা থেকে ওঠে কুরাইশরা যেমন (পূর্বে) মূর্তিপূজারী ছিল ঠিক তদ্রুপ মূর্তিপূজারীই রয়ে যায়।" এমন নয় যে, তারা একত্ববাদী হয়ে গিয়েছিল।

"যাহোক, এটি একটি ঘটনা যা বিভিন্ন সহীহ্ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত। অতএব ইথিওপিয়ার মুহাজিরদের ফিরে আসার ঘটনা যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে মনে হচ্ছে, এ ঘটনার পর কুরাইশরা যারা ইথিওপিয়ার মুহাজিরদের ফিরিয়ে আনার জন্য অস্থির হয়ে পড়ছিল; তারা এই (সিজদা বা) কাজকে পুঁজি করে নিজেরাই এই গুজব রটিয়ে দিয়ে থাকবে যে, মক্কার কুরাইশরা মুসলমান হয়ে গেছে। আর এখন মুসলমাদের জন্য মক্কাতে পুরোপুরি শান্তি বিরাজমান। এ গুজব যখন ইথিওপিয়ার মুহাজিরদের নিকট পৌঁছে; তখন তা শুনে তারা স্বভাবতই খুবই আনন্দিত হন এবং আনন্দের আতিশয্যে তারা ফিরে আসেন। কিন্তু তারা যখন মক্কার অদূরে পৌঁছেন তখন প্রকৃত ঘটনা জানতে পারেন; তখন অনেকে গোপনে আর অনেকে কুরাইশদের কোন প্রভাবশালী বা ক্ষমতাধর নেতার নিরাপত্তায় মক্কায় প্রবেশ করেন আবার কেউ কেউ ফিরে চলে যান (ইথিপিয়ায়)। অতএব যদি কুরাইশদের মুসলমান হয়ে যাওয়ার গুজবের কোন সত্যতা থেকে থাকে তাহলে তা কেবল ততটা যতটা সূরা নজম পাঠের পর সিজদায় পতিত হওয়ার ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন।

যাহোক, ইথিওপিয়ার মুহাজিররা যদি ফিরে এসেও থাকেন তাহলে তাদের অধিকাংশই আবার ফিরে যায়; আর কুরাইশরা যেহেতু প্রতিনিয়ত নিজেদের নির্যাতন-নিপীড়নের মাত্রা বৃদ্ধি করছিল আর তাদের যুলুম-অত্যাচার

ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তাই মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে অন্য মুসলমানরাও সংগোপনে হিজরতের প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করেন এবং সুযোগ বুঝে ধীরে ধীরে মক্কা থেকে বেরিয়ে যেতে থাকেন। এই হিজরতের ধারা এমনভাবে চলতে থাকে যে, অবশেষে ইথিওপিয়ায় মুহাজিরদের সংখ্যা একশ' এক পর্যন্ত পৌঁছে যায়; যাদের মধ্যে আঠারোজন মহিলাও ছিলেন। আর মক্কায় মহানবী (সা.)-এর কাছে অল্প কয়েকজন মুসলমানই রয়ে গিয়েছিলেন। এ হিজরতকে কতিপয় ঐতিহাসিক ইথিওপিয়ার দ্বিতীয় হিজরত বলে আখ্যায়িত করে থাকেন...।"

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এরপর নিজের একটি বিশ্লেষণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "আরেকটি বিষয় রয়েছে যা এ গুজব এবং মুহাজিরদের ফেরত আসার পুরো ঘটনাকেই সন্দেহযুক্ত করে তুলে আর তা হল; ইতিহাসে ইথিওপিয়ার হিজরতের তারিখ লিখা আছে ৫ম নববীর রজব মাস আর সিজদার ঘটনা ৫ম নববীর রমযানে ঘটেছে বলে বর্ণিত আছে। অধিকন্তু ইতিহাসে একথাও বর্ণিত আছে, সেই গুজবের ফলে ইথিওপিয়ার মুহাজিরদের প্রত্যাবর্তনের ঘটনা ঘটে ৫ম নববীর শওয়াল মাসে। বলতে গেলে, হিজরতের সূচনা এবং মুহাজিরদের ফিরে আসার মাঝে কেবল দুই বা তিন মাসের ব্যবধান ছিল। আর সিজদার তারিখ থেকে যদি সময় গণনা করা হয় তাহলে এই সময়কাল কেবল একমাস হয়। সেই যুগের অবস্থার প্রেক্ষিতে এই অল্প সময়ের মধ্যে মক্কা ও ইথিওপিয়ার মাঝে তিনটি সফর সম্পন্ন হওয়া সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। অর্থাৎ প্রথমে মুসলমানদের ইথিওপিয়ায় যাওয়া এরপর কুরাইশদের মুসলমান হওয়ার সংবাদ নিয়ে মক্কা থেকে কারো ইথিওপিয়ায় পৌছাঁনো আর তারপর মুসলমানদের ইথিওপিয়া থেকে যাত্রা করে মক্কায় ফিরে আসা। এই তিনটি সফর, প্রস্তুতি ও আনুসঙ্গিক বিষয়াদি বাদ দিলেও এই অল্প সময়ের ভেতর সম্পূর্ণ অসম্ভব। সিজদার যুগ থেকে আরম্ভ করে মুহাজিরদের ইথিওপিয়ায় গিয়ে তথাকথিত প্রত্যাবর্তন বা দু'টি সফর সম্পন্ন করা আরো বেশি অসম্ভব ছিল। কেননা সেই যুগে মক্কা থেকে ইথিওপিয়া যাওয়ার জন্য প্রথমে দক্ষিণ দিকে যেতে হতো, তারপর নৌকাযোগে যা সবসময় পাওয়া যেত না, লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে আফ্রিকার উপকূল পর্যন্ত যেতে হতো। এরপর উপকূল থেকে ইথিওপিয়ার রাজধানী উকসুম পর্যন্ত যা উপকূল থেকে অনেক দুরত্বে অবস্থিত, সেখানে পৌঁছাতে হতো। সেই যুগের ধীরগতি সম্পন্ন বাহনের দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের একটি সফরও দেড় দু'মাসের পূর্বে সম্পন্ন করা মোটেও সম্ভব ছিল না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে এই কাহিনী সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা আখ্যা পায়। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, এতে কোন সত্য রয়েছে তাহলে তা কেবল সেটিই যা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। ওয়াল্লাহু আ'লামু, অর্থাৎ আল্লাহ্ই ভালো জানেন।" **(সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তক, পৃঃ ১৪৬-১৫২)**

মোটকথা এর কারণ যা-ই থাকুক, কিছুদিন পর হযরত উসমান (রা.) ইথিওপিয়া থেকে ফিরে আসেন। এরপর হযরত উসমান (রা.)'র মদীনায় হিজরত এবং ভ্রাতৃত্ববন্ধন রচনার উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায়, হযরত মুহাম্মদ বিন জা'ফর বিন যুবায়ের (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উসমান (রা.) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পর বনূ নাজ্জার গোত্রের হযরত হাস্সান বিন সাবিত (রা.)'র ভাই হযরত অওস বিন সাবিত (রা.)'র বাড়িতে অবস্থান করেন।

মূসা বিন মুহাম্মদ তার পিতার বরাতে বলেন, মহানবী (সা.) হযরত উসমান (রা.) এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। আরেক বর্ণনা অনুসারে, হযরত শাদ্দাদ বিন অওস (রা.)'র পিতা হযরত অওস বিন সাবিত (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন রচনা করা হয়েছিল। আর এটিও বলা হয়, হযরত আবু উবাদাহ্ সা'দ বিন উসমান যুরাকী (রা.)'র সাথে হযরত উসমান (রা.)-এর ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপিত হয়েছিল। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩১, উসমান বিন আফ্ফান (রা.), বৈরুতের দারুল এহইয়াউত্ তারাসুল আরবী থেকে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত}**

আরেক বর্ণনা অনুযায়ী, মহানবী (সা.) নিজের সাথে হযরত উসমান (রা.)'র ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেছিলেন। তাবাকাতে কুবরা-তে লেখা আছে, ইবনে লাবীবাহ্ বর্ণনা করেন, হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) যখন অবরুদ্ধ হন অর্থাৎ, শেষের দিনগুলোতে যখন শত্রুরা তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখে, সর্বপ্রকার নিষেধাজ্ঞা তাঁর ওপর আরোপ করে, তখন তিনি (রা.) একটি উঁচু কুঠুরির জানালা দিয়ে উঁকি মেরে লোকদের জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের মাঝে কি তালহা আছে? তারা বলে, হ্যাঁ, আছে। অতঃপর তিনি হযরত তালহা (রা.)-কে বলেন, খোদার দোহাই দিয়ে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, মহানবী (সা.) যখন মুহাজির এবং আনসারদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেছিলেন তখন তিনি (সা.) কি নিজের সাথে আমার ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন নি? অর্থাৎ, মহানবী (সা.) নিজের সাথে হযরত উসমান (রা.)'র ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়েছিলেন। উত্তরে হযরত তালহা (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! একথা সঠিক। তার চারপাশে বিরোধীরাই ছিল, যারা হযরত উসমান (রা.)'র বাড়ি অবরোধ করে রেখেছিল। উত্তর শুনে, তারা হযরত তালহা (রা.)'র ওপর চড়াও হয়ে বলে, তুমি এটি কী করলে? তখন হযরত তালহা (রা.) অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে বলেন, হযরত উসমান (রা.) আমাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন এবং যে বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন তা আমার চোখের সামনে ঘটেছিল। তারপরও কি আমি এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করবো না? **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮, যিকরু মা কীলা লিউসমানা ফীল্ খালয়ে', বৈরুতের দারুল এহইয়াউত্ তারাসুল আরবী থেকে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত}**

আমি তো মিথ্যা বলতে পারি না। তোমাদের যা বিরোধিতা করার কর।

হযরত রুকাইয়্যা (রা.)'র মৃত্যু এবং হযরত উম্মে কুলসুম (রা.)'র সাথে বিয়ের ঘটনার উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায় যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুকনেফ বিন হারেসাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন বদরের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন তখন তিনি হযরত উসমান (রা.)-কে নিজ কন্যা হযরত রুকাইয়্যা (রা.)'র পাশে রেখে যান, কেননা তিনি ভীষণ অসুস্থ ছিলেন। আর বদরের প্রান্তরে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে যে বীজয় দান করেছিলেন সেই সুসংবাদ নিয়ে হযরত যায়েদ বিন হারেসাহ্ (রা.) যেদিন মদীনায় এসেছিলেন; (ঠিক) সেদিনই হযরত রুকাইয়্যা (রা.) মৃত্যুবরণ করেন। মহানবী (সা.) বদরের মালে গণীমতে হযরত উসমান (রা.)'র জন্য বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সমান অংশ নির্ধারণ করেছিলেন। হযরত রুকাইয়্যা (রা.)'র মৃত্যুর পর মহানবী (সা.) হযরত উসমান বিন আফফান (রা.)'র সাথে নিজ কন্যা সাহেবযাদী হযরত উম্মে কুলসুম (রা.)-কে বিয়ে দেন। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩২, উসমান বিন আফ্‌ফান (রা.), বৈরুতের দারুল এহইয়াউত্ তারাসুল আরবী থেকে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত}**

হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মসজিদের দরজায় মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত উসমান (রা.)'র সাক্ষাৎ হলে তিনি (সা.) বলেন, উসমান! ইনি জিবরাঈল। **তিনি আমাকে সংবাদ প্রদান করেছেন, রুকাইয়্যার সাথে তোমার উত্তম আচরণের কারণে আল্লাহ্ তা'লা রুকাইয়্যার সমপরিমাণ দেন মোহরে তোমার সাথে উম্মে কুলসুমের বিয়ে করিয়ে দিয়েছেন।** **(সুনান ইবনে মাজাহ্, ইফতেতাহুল কিতাব ফযলে উসমান (রা.), হাদীস নংঃ ১১০)**

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, দ্বিতীয় কন্যার বিয়েও যেন হযরত উসমান (রা.)'র সাথে দেয়া হয়।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন উম্মে কুলসুমকে হযরত উসমান (রা.)'র সাথে বিয়ে দেন তখন তিনি (সা.) হযরত উম্মে আয়মান (রা.)-কে বলেন, আমার কন্যা উম্মে কুলসুমকে প্রস্তুত করে উসমানের বাড়িতে রেখে আসো এবং তার সামনে ঢোল বাজাও। অতএব, তিনি এমনটিই করেন। মহানবী (সা.) তিনদিন পর উম্মে কুলসুমের কাছে যান এবং বলেন, **হে আমার প্রিয় কন্যা! নিজের স্বামীকে তুমি কেমন পেয়েছ? উম্মে কুলসুম (রা.) বলেন, তিনি সর্বোত্তম স্বামী।** **(আলী মুহাম্মদ আল্ সালাবী রচিত সীরাত আমীরুল মু'মিনীন উসমান বিন আফ্‌ফান শাখসিয়্যাতুহু ওয়া আসরুহু, পৃঃ ৪১, ১ম অধ্যায়, যুন্নুরাইন উসমান বিন আফ্‌ফান বাইনা মক্কাতা ওয়াল মদীনাতি, যেওয়াজুহু মিন উম্মে কুলসুম, ৩য় হিজরী, বৈরুতের দারুল্ মা'রেফাহ্ থেকে ২০০৬ সালে প্রকাশিত)**

৯ম হিজরী পর্যন্ত হযরত উম্মে কুলসুম (রা.) হযরত উসমান (রা.)'র সাথে ছিলেন। এরপর অসুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মহানবী (সা.) তাঁর জানাযার নামায পড়ান আর তার সমাধির পাশে বসেন। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-কে তিনি হযরত উম্মে কুলসুম (রা.)'র কবরের পাশে অশ্রুসিক্ত নয়নে বসে থাকতে দেখেন। **{আলী মুহাম্মদ আল্ সালাবী রচিত সীরাত আমীরুল মু'মিনীন উসমান বিন আফ্ফান শাখসিয়্যাতুহু ওয়া আসরুহু, পৃঃ ৪২, ৩য় পরিচ্ছেদ, মুলাযিমাতুহু লিন্নবীয়্যে (সা.) ফীল মদীনাহ্, ওফাতু উম্মে কুলসুম, বৈরুতের দারুল্ মা'রেফাহ্ থেকে ২০০৬ সালে প্রকাশিত}**

বুখারী শরীফের একটি হাদীসে এই ঘটনাটির উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে যে, হযরত আনাস বিন মালিক (রা.)'র বরাতে হেলাল বর্ণনা করেন, তিনি [অর্থাৎ আনাস (রা.)] বলতেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর কন্যার জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। তিনি (রা.) বলেন, রসলুল্লাহ্ (সা.) সমাধির পাশে বসে ছিলেন আর তখন আমি দেখি তাঁর চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। **(সহীহ্ বুখারী কিতাবুল জানায়েয, বাবু মাইয়্যাদখুলু কাবরাল মার্‌রা হাদীস নংঃ ১৩৪২, সহীহ্ বুখারীর উর্দূ অনুবাদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৬৩, নাযারাতে এশায়াত রাবওয়া কর্তৃক প্রকাশিত)**

এক বর্ণনায় রয়েছে, মহানবী (সা.) হযরত উম্মে কুলসুম (রা.)'র মৃত্যুতে বলেন, **'আমার তৃতীয় কোন মেয়ে থাকলে আমি তাকেও উসমানের কাছে বিয়ে দিতাম'**। **{আত্ তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩২, উসমান বিন আফ্ফান (রা.), বৈরুতের দারুল এহইয়াউত্ তারাসুল আরবী থেকে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত}**

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) কোন এক জায়গা দিয়ে যাওয়ার সময় দেখেন, হযরত উসমান (রা.) সেখানে বসে আছেন আর তিনি মহানবী (সা.)-এর কন্যা হযরত উম্মে কুলসুম (রা.)'র মৃত্যুশোকে কাঁদছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা.)-এর সাথে তাঁর দু'জন সঙ্গী, অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)ও ছিলেন। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, হে উসমান! তুমি কাঁদছো কেন? তিনি অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি কাঁদছি কেননা, আপনার সাথে আমার জামাতার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। (আপনার) দু'কন্যাই মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি (সা.) বলেন, কেঁদো না। সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যদি আমার ১০০জন মেয়েও থাকত আর তাদের প্রত্যেকেই এক এক করে মৃত্যুবরণ করত তাহলে আমি একজনের পর অপরজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতাম, এমনকি ১০০ জনের মধ্যে একজনও অবশিষ্ট থাকত না। **(কসযুল উম্মাল, ১৩তম খণ্ড, পৃঃ ২১, কিতাবুল ফাযায়েল ফাযায়েলুস্ সাহাবাহ্, ফাযায়েলু যুন্নুরাইন উসমান বিন আফ্ফান, হাদীস নংঃ ৩৬২০১, বৈরুতের দারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০০৪ সালে প্রকাশিত)**

যাহোক এটি ছিল (তাদের) ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ যা উভয় পক্ষ থেকে হয়েছে। হযরত উসমান (রা.)'র এক উৎকণ্ঠা ছিল। এই আত্মীয়তার সম্পর্কটি মহানবী (সা.) বহাল রাখেন এবং এই নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, এই সম্পর্ক তো এখনো প্রতিষ্ঠিত আছে। অবশিষ্ট স্মৃতিচারণ আগামীতে হবে, ইনশাআল্লাহ্।

যেমনটি আমি প্রত্যেক জুমুআতেই আহ্বান করছি, (অর্থাৎ) দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, পাকিস্তানের মানুষদের জন্য বিশেষ করে আহমদীদের জন্য দোয়া করতে থাকুন। বিরুদ্ধবাদীরা তো নিজেদের ধ্যান-ধারণানুসারে (আমাদের) গণ্ডি সংকীর্ণ করছে কিন্তু তারা জানে না, (সবার ওপর) এক মহান সত্তাও রয়েছেন অর্থাৎ খোদাও রয়েছেন যাঁর নিয়তি চলমান আছে, তাঁর বেষ্টনীও তাদের জন্য সংকীর্ণ হচ্ছে আর তা যখন সংকীর্ণ হয়ে আসে তখন তা থেকে নিস্কৃতি পাওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'লা এসব লোককে বিবেকবুদ্ধি দান করুন আর তারা যেন এখনো বিবেকবুদ্ধি খাটায়, ন্যায়বিচার করে এবং অযথা নিপীড়ন, নির্যাতন ও সীমালঙ্ঘণ করা থেকে বিরত হয়। অনুরূপভাবে আলজেরিয়ার আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন যাতে তাদের ঈমান নিরাপদ থাকে। একইভাবে আরো কোন কোন স্থানেও আহমদীদের চরম বিরোধিতা হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক স্থানে, প্রত্যেক আহমদীকে সবদিক থেকে সুরক্ষিত রাখুন।

নামাযের পর কয়েকটি গায়েবানা জানাযা পড়াব, তাদের স্মৃতিচারণও এখানে করে দিচ্ছি। প্রথম স্মৃতিচারণ হল, মোকার্‌রম মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেবের। তিনি সাবেক নাযের ইসলাহ্ ও ইরশাদ মর্কযিয়া, নাযের খিদমতে দরবেশান এবং নাযের রিশতানাতাও ছিলেন। তিনি গত ১১ জানুয়ারি রাবওয়ায় প্রায় ৮৮ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

তার পিতার নাম চৌধুরী মুহাম্মদ দ্বীন এবং মাতার নাম ছিল রহমত বিবি। তার পিতা ১৯২৮ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)'র হাতে বয়আত গ্রহণের মাধ্যমে আহমদীয়াতের ভূবনে পদার্পণ করেছিলেন। হযরত মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার সাহেব তার একমাত্র পুত্র ছিলেন। মওলানা সুলতান মাহমুদ আনওয়ার সাহেব মিডল (অর্থাৎ মাধ্যমিক) পর্যন্ত পড়াশোনা করার পর ১৯৪৬ সালের এপ্রিলে জীবন উৎসর্গ করে কাদিয়ানের মাদ্রাসা আহমদীয়ায় ভর্তি হন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর আহমদনগরে অবস্থিত জামেয়া আহমদীয়ায় চলে যান, যেখান থেকে ১৯৫২ সালে মৌলভী ফাযেল পরীক্ষা দেন এবং ১৯৫৬ সালের এপ্রিলে জামেয়া আহমদীয়া থেকে শাহেদ ডিগ্রি লাভ করেন। সেখানেই চৌধুরী সা'দ উদ্দীন সাহেবের কন্যা মাহমুদা শওকত সাহেবাকে তিনি বিয়ে করেন। ১৯৬০ সালের বার্ষিক জলসায় মওলানা জালাল উদ্দীন শামস সাহেব তার বিয়ে পড়ান। তার সন্তানদের মধ্যে চার পুত্র এবং দু'জন কন্যা রয়েছেন। তার এক পুত্র হাসান মাহমুদ ওয়াকেফে যিন্দেগী (জীবনোৎসর্গকারী), তিনি রাবওয়ায় তাহরীকে জাদীদ দপ্তরে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করছেন। মোকাররম মওলানা সাহেবের প্রথম পদায়ন হয়েছিল গুজরাতে, একইভাবে তিনি মুরব্বী সিলসিলাহ্ হিসেবে পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত তিনি ঘানাতে ছিলেন। এটি সেই যুগের কথা যখন আমিও সেখানে ছিলাম আর তিনিও সেখানে ছিলেন। আমি দেখেছি, তিনি অত্যন্ত নিঃস্বার্থহীনভাবে সেখানে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৮২ থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত তিনি মজলিসে কারপরদাযের সেক্রেটারীও ছিলেন, এরপর ৮৩ সালে মজলিসে কারপরদাযের প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন। ১৯৮৩ থেকে ৯৮ পর্যন্ত তিনি নাযের ইসলাহ্ ও ইরশাদ মর্কযিয়ার দায়িত্ব পালন করেন, এরপর ২০১১ পর্যন্ত নাযের খিদমতে দরবেশান এবং ২০১১ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত নাযের রিশতানাতা ছিলেন এবং ২০১৭ সালে অসুস্থতার কারণে অবসর গ্রহণ করেন। তার মাঝে তবলীগ করার, মানুষের সাথে কথাবার্তা বলার এবং বক্তৃতা প্রদানেরও অনেক দক্ষতা ছিল। এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যাতে তিনি বিভিন্ন মতাদর্শের অনুসারী মানুষের সাথে এবং আলেম সম্প্রদায়ের সাথে বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয়ে আলোচনা হতো এবং তিনি অত্যন্ত যৌক্তিক ও জ্ঞানগর্ভ উত্তর প্রদান করতেন। যেমনটি আমি বলেছি, তিনি একজন সুবক্তা ছিলেন, শ্রোতামণ্ডলীকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে পারতেন। যেসব মুরব্বী তার সাথে কাজ করেছেন তারাও একথাই লিখেছেন, তিনি আমাদেরকে সাথে নিয়ে চলতেন। প্রত্যেকেই লিখেছেন, আমাদের সাথে অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ আচরণ করতেন। নিজেও তাহাজ্জুদ ও ইবাদতকারী ছিলেন এবং অন্যদেরও, বিশেষ করে মুরব্বীদেরকে তাহাজ্জুদ ও ইবাদতের ব্যাপারে উপদেশ দিতেন। তিনি খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের এক অসাধারণ মানে উপনীত ছিলেন। চতুর্থ খিলাফতের যুগে তাকে কিছুটা পরীক্ষারও সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু পরিপূর্ণ আনুগত্যের সাথে তিনি সেই যুগ অতিবাহিত করেন এবং অধীনস্ত থেকেও কাজ করেছেন। বরং কেউ তাকে বলেছিলও, পূর্বে আপনি নাযের ছিলেন আর এখন এর পরিবর্তে অন্য কোন নাযেরের অধীনে কাজ করতে হচ্ছে! কয়েকজন মুরব্বী আমাকেও লিখেছেন এবং তার এক কন্যাও একথা লিখেছিলেন যে, তিনি তখন প্রত্যুত্তরে বলেন, যুগ-খলীফা ভালোভাবে জানেন, কার কোথায় কী প্রয়োজন। আমি জীবন উৎসর্গ করেছি, আমাকে যদি ঝাড়ু দেয়ার কাজেও লাগানো হয়, আমি সেই কাজই করব, যার নির্দেশ যুগ-খলীফা প্রদান করবেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লা অবস্থার উন্নতি ঘটান। আমি মনে করি, তার সেই পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের দৃষ্টান্ত গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা লাভ করে আর তিনি পুনরায় সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সদস্যও হন এবং নাযের-ও হন। যেখানেই ছিলেন আমীরের সাথে পরিপূর্ণ

সহযোগিতা ও আনুগত্যের আদর্শ প্রদর্শন করেছেন, করাচিতেও এবং অন্যান্য স্থানেও। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন এবং তার সন্তানসন্ততিকেও তার পুণ্যগুলোকে ধরে রাখার সৌভাগ্য দান করুন। তিনি সাহিত্যাঙ্গনেও বেশ কিছু কাজ করেছেন, পুস্তকাদি রচনা করেছেন। তার একটি বই হল, **'কলেমা তৈয়্যেবা কি আযমত কা কিয়াম আহ্মাদী কি প্যাহচান'** (অর্থাৎ কলেমা তাইয়্যেবার মর্যাদা প্রতিষ্ঠাই একজন আহমদীর পরিচয়), তার রচিত অন্যান্য পুস্তক হল, **'আল্লাহ্ তা'লা, হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.), কুরআনে করীম আওর খানা কা'বা'**, এরপর তার আরেকটি বই হল, **'জামা'তে আহমদীয়া কি তা'দাদ কা মাসলা'**, আরেকটি বই হল, **'নেফাযে শরীয়্যত মে নাকামী কে আসবাব',** আরেকটি বই হল, **'তওহীনে রিসালাত কি সাযা'**। যাহোক, তার এসব রচনা রয়েছে, সাহিত্যাঙ্গনেও তিনি কাজ করেছেন। যেভাবে আমি বলেছি, তিনি খুবই বস্তুনিষ্ঠ কাজ করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি করুণা ও ক্ষমাসূলভ আচরণ করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হল, কাদিয়ানের সাবেক নাযের ইসলাহ্ ও ইরশাদ মর্কযিয়া মওলানা মুহাম্মদ উমর সাহেবের যিনি পি, কে ইব্রাহীম সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি ১২ জানুয়ারি, ৮৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

মরহুম কেরালার অধিবাসী ছিলেন। তার পিতা ইব্রাহীম কুট্টি সাহেব জামা'তের চরম বিরোধী ও শত্রু ছিলেন। (প্রয়াত) মওলানা সাহেবের জন্মের ১০ বছর পূর্বে তার পিতা ব্যবসার কাজে বোম্বে যান। সে যুগে বোম্বেতে অনেক আহমদী ব্যবসাবাণিজ্য করতেন। বোম্বের মালাবারের কয়েকজন আহমদীর সাথে তার সাক্ষাৎ হয় এবং আহমদীয়া জামা'তের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে মতবিনিময় হয় আর ১৯২৪ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) যখন বোম্বে যান তখন হুযূরের কল্যাণময় হাতে বয়আত করে তিনি জামা'তভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি কাদিয়ান যিয়ারতেরও তৌফিক পান।

মওলানা উমর সাহেব ১৯৫৪ সনে কাদিয়ানে আসেন, দেশ বিভাগের পর নুতনভাবে তখন মাদ্রাসা আহমদীয়া চালু হয়েছিল। তিনি ১৯৫৫ সনে মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং ১৯৬১ সনে মাদ্রাসা আহমদীয়া এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মৌলভী ফাযেল পাশ করার পর ১ বছর মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। ছাত্র জীবনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত ভাই আব্দুর রহমান সাহেব কাদিয়ানী (রা.)'র ইচ্ছায় প্রায় ১ বছর যাবৎ প্রতিদিন সকালে তাঁর বাড়িতে গিয়ে মরহুম পবিত্র কুরআন শোনানোর সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৬২ সন থেকে তিনি তবলীগের ময়দানে কর্মজীবনের সূচনা করেন। ভারতের বড় বড় শহরে কাজ করেন এবং অত্যন্ত সফল মুবাল্লিগ হিসেবে সেবা প্রদান করতে থাকেন। বিভিন্ন তবলীগি সভায় তিনি বক্তৃতা দিতেন। 'মুনাযেরা ইয়াদগীর'এ তিনি অংশ নেন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র বিশেষ নির্দেশনায় কোয়েম্বেটোর-এর এই ঐতিহাসিক মুনাযেরা যা লাগাতার ৯দিন পর্যন্ত চলে আর এতে বিশেষ করে মওলানা দোস্ত মুহাম্মদ শাহেদ সাহেব এবং কেন্দ্র থেকে আরেকজন প্রতিনিধি হাফেয মুজাফ্ফর সাহেবও গিয়েছিলেন, তাদের সাথে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) একস্থানে তার কাজের ভূয়সী প্রশংসা করে নিজের এক খুতবায় বলেছিলেন, কোন কোন জামা'ত এমন আছে যেখানে একজন মানুষই রয়েছে, যিনি একাই তাৎক্ষণিকভাবে পুরো বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নেন আর অনুবাদ করে অর্থাৎ খুতবার অনুবাদ করে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যাপক পরিসরে প্রচার করেন। আর খোদা তা'লার কৃপায় এমন জামা'তগুলো ক্রমশ উন্নতির দিকে ধাবমান, কেননা তারা তাৎক্ষণিকভাবে যুগ-খলীফার খুতবা পেয়ে যায়। এতে পুরো জামা'ত জানতে পারে যে, কী হচ্ছে। দক্ষিণ ভারতে আমাদের এমন জামা'ত রয়েছে যারা উর্দূ বুঝে না সেখানে আমাদের জামা'তের মুবাল্লিগ মৌলভী মুহাম্মদ উমর সাহেব রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে এ কাজের (জন্য) উন্মাদনা দিয়েছেন। (খুতবা) শোনামাত্রই তিনি তা অনুবাদ করে তাৎক্ষণিভাবে

গোটা জামা'তের কাছে পৌঁছে দেন। কাজেই অত্যন্ত পরিশ্রম করে তিনি এ কাজ করতেন। তিনি প্রায় এক বছর ফিলিস্তিনেও কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। পবিত্র কুরআন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অগণিত বই-পুস্তক আর পত্র-পত্রিকার মালয়ালম ও তামিল ভাষায় অনুবাদ করার তৌফিক পেয়েছেন। ২০০৭ সনে আমি তাকে নাযের ইসলাহ্ ও ইরশাদ মর্কযিয়া নিযুক্ত করি এবং এরপর এডিশনাল নাযের ইসলাহ্ ও ইরশাদ তা'লীমুল কুরআন এবং ওয়াক্‌ফে আরযী নিযুক্ত করি, এছাড়া নায়েব নাযের-এ আ'লা হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য পান। তিনি অত্যন্ত সুচারুরূপে এসব দায়িত্ব পালন করেন। মাদ্রাসা আহমদীয়া থেকে পাশ করে বের হওয়ার পর মরহুম সর্বমোট ৫৩ বছর পর্যন্ত জামা'তের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি চার কন্যা, জামাতা, দৌহিত্র-দৌহিত্রী এবং প্রদৌহিত্র-দৌহিত্রীও রেখে গেছেন। জামা'তের সেবা করার ক্ষেত্রে তার মাঝে এক প্রকার উন্মাদনা ছিল। পরিবারের সাথেও যখন কোন ব্যক্তিগত সফরে যেতেন তখন সফরের সময়ও জামা'তী কাজ, বিশেষত অনুবাদ প্রভৃতির কাজে ব্যস্ত থাকতেন।

শ্রীলঙ্কার ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট সাহেব লিখেন, আহমদীয়া জামাত, শ্রীলঙ্কার ইতিহাসে সেই স্বর্ণযুগ সর্বদা সুরক্ষিত থাকবে যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)'র আশিসময় যুগে আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ হিসেবে মওলানা সাহেবের প্রথম শুভাগমন ঘটেছিল ১৯৭৮ সালে। জামা'তের মাঝে তখন অসাধারণভাবে এক নতুন আধ্যাত্মিক উদ্দীপনার সাথে সংশোধন ও পবিত্র পরিবর্তন পরিলক্ষিত হতে থাকে। সেখানে মরহুম মওলানা সাহেবের অমূল্য সেবা রয়েছে। ১৯৯৪ সালে কলম্বো শহরের রামকৃষ্ণের এক বিশাল হলে মওলানা সাহেবের **'শান্তি ও ঐক্য'** শিরোনামে এমন জোরালো একটি বক্তৃতা হয়, যা শ্রবণের জন্য চার শতাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করে। বিশেষভাবে এই রামকৃষ্ণ আন্দোলনের দেশীয় প্রধান এবং রাষ্ট্রের হিন্দু সংস্কৃতি বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী দেবরাজ প্রয়াত মওলানা সাহেবের বক্তৃতা শুনে অভিভূত হয়ে পড়েন এবং ভূয়সী প্রশংসা করতে থাকেন। কেননা এই বক্তৃতায় মওলানা সাহেব গীতা থেকে মন্ত্র পাঠ করে মহানবী (সা.)-এর সত্যতা সাব্যস্ত করেছিলেন। এজন্যই তার সেই ঐতিহাসিক বক্তৃতাটি আজও তাদের নিকট জনপ্রিয়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর চারটি পুস্তক তিনি তামিল ভাষায় অনুবাদ করেছেন। এছাড়া তিনি স্বয়ং বিভিন্ন বিষয়ে তামিল ভাষায় সাতটি পুস্তক রচনা করেছেন। তামিলনাড়ু প্রদেশে জামা'তী পত্রিকা **'সামাদানা ওয়াঝী'** প্রকাশনা আরম্ভ করে দীর্ঘদিন পর্যন্ত সেখান থেকে ও অন্যান্য প্রদেশ থেকে প্রকাশ করতে থাকেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসূলভ আচরণ করুন, (তার) পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তানসন্ততিকেও পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত থাকার তৌফিক দিন।

পরবর্তী জানাযা হল, মুরব্বী সিলসিলাহ্ মোকাররম হাবীব আহমদ সাহেবের, যিনি রাবওয়ার ফ্যাক্টরী এরিয়া নিবাসী মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবের পুত্র ছিলেন। তিনি গত ২৫ ডিসেম্বর, ইসলামাবাদে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৬৪ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন; إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

তিনি ১৯৭৯ সালে জামেয়া পাশ করেন। এরপর পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলায় তিনি কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৮৯ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত নাইজেরিয়াতে সেবা করার সুযোগ লাভ করেছেন। তখন তিনি ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০০০ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত নাইজেরিয়া জামা'তের আমীর এবং মিশনারী ইনচার্জও ছিলেন। তিনি বিনয় ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। দাপ্তরিক দায়িত্ব ছাড়া পাড়ার তরবিয়তী দায়িত্বও তিনি সুচারুরূপে পালন করতেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি স্ত্রী ছাড়া তিন কন্যা এবং দুই পুত্র রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সাথে ক্ষমা ও দয়াসুলভ ব্যবহার করুন আর তাঁর সন্তানসন্ততিকেও বিশ্বস্ততার সাথে জামা'তের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার তৌফিক দান করুন।

পরবর্তী জানাযা মোকাররম বদরুজ্জামান সাহেবের, যিনি কিছুকাল যাবৎ যুক্তরাজ্যের ওকালতে মাল-এর কর্মী ছিলেন। তিনি গত ৩ জানুয়ারি ইহধাম ত্যাগ করেন; إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

মরহুম অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং পরিশ্রমী কর্মী ছিলেন। তিনি ১৯৪৪ সালে অমৃতসরে জন্মগ্রহণ করেন; জন্মগত আহমদী ছিলেন। সরকারী চাকুরিরত অবস্থায় তিনি কোয়েটা জেলার খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ হিসেবে সেবাদানের সুযোগ লাভ করেন। এরপর আনসারুল্লাহ্ বেলুচিস্তানের নাযেমও ছিলেন। ১৯৮৬ সালে তাঁর বিরুদ্ধে একটি মামলাও দায়ের করা হয় যার প্রেক্ষিতে তিনি আল্লাহ্‌র পথে বন্দী-জীবন কাটানোর সম্মানও লাভ করেছেন। ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত রাবওয়ার ওকালতে মাল আউয়াল-এ সেবা করেছেন। এখানে লণ্ডনে আসার পর রাকীম প্রেসে; অতঃপর ১৭ বছর লন্ডনের এডিশনাল ওকালতে মাল-বিভাগে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসূলভ ব্যবহার করুন।

পরবর্তী জানাযা মোকাররম মনসূর আহমদ তাসীর সাহেবের, যিনি মুরব্বী সিলসিলাহ্ মৌলভী মুহাম্মদ আহমদ নঈম সাহেবের পুত্র ছিলেন এবং রাবওয়ার নাযারতে উমূরে আম্মাহ্'র এহতেসাব বিভাগের কর্মী ছিলেন। তিনি এখানে লণ্ডনে তার পুত্রের কাছে এসেছিলেন এবং গত ৩০ ডিসেম্বর ৭০ বছর বয়সে নিয়তির বিধান অনুযায়ী মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

তিনি জীবনের প্রায় পঁচিশ বছর ধর্মসেবার উদ্দেশ্যে জামা'তের কর্মী হিসেবে বিভিন্ন দপ্তরে সেবা করার তৌফিক লাভ করেছেন। অত্যন্ত মিশুক, ধার্মিক এবং স্নেহশীল মানুষ ছিলেন। খিলাফতের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিক ভালোবাসা পোষণ করতেন, অন্যদেরও এ ব্যাপারে উপদেশ দিতেন। সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের সাথে বিষয়াদির সমাধান করতেন। সাধারণত জটিল বিষয়গুলো তার কাছে সোপর্দ করা হতো। কখনো কখনো উভয় পক্ষ রাগ ও ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে দফতরে আসত, কিন্তু তিনি ভালোবাসা ও স্নেহের সাথে তাদের আবেগ ও ক্রোধকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতেন আর সমস্যার সমাধান করে দিতেন। জামা'তের সেবা করার এরূপ স্পৃহা ছিল যে, তার স্ত্রী লিখেন– তার কন্যা ডাক্তার ফারেয়াহ্ মনসূর-এর ওলীমার দাওয়াত ছিল। সেদিন সকালবেলা তিনি প্রস্তুত হয়ে দপ্তরের উদ্দেশ্যে বের হতে গেলে স্ত্রী বলেন, এটি বিয়ে বাড়ি; আজ অন্তত ছুটি নিয়ে নিন। তিনি উত্তরে বলেন– দাওয়াতের সময় (দুপুর) দু'টায়; সময় নষ্ট করার কী প্রয়োজন? আমি এখন দপ্তরে যাচ্ছি, তখন চলে আসব। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে সম্মান ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করতেন। কোন বিষয়ে মতের অমিল হলে সম্মানের দাবি বজায় রাখতেন এবং সর্বদা ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করতেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী রুখশান্দাহ্ সাহেবা, দুই পুত্র এবং দু'জন কন্যা রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসূলভ আচরণ করুন।

শিশুকাল থেকেই আমি তাকে চিনি। তিনি আমার সহপাঠী ছিলেন। সর্বদা আমি দেখেছি, তার মাঝে খুবই ভদ্রতাবোধ ছিল আর রসবোধ সম্পন্ন মানুষ ছিলেন, কখনো রাগ না করা, কখনো বিবাদে না জড়ানো (ছিল তার বৈশিষ্ট্য আর) এই বিষয়টি শেষ পর্যন্ত তার মাঝে ছিল। যার ফলে তিনি মানুষের মাঝে মীমাংসা করানোর ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

পরবর্তী জানাযা হল, তানজানিয়ার ডাক্তার উবায়দী ইব্রাহীম মুয়াঙ্গা সাহেবের, যিনি গত ৯ ডিসেম্বর ৭৩ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

(তিনি) উগান্ডার মাকেরেরে (Makerere) বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিকেল বিভাগে ভর্তি হন এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় পূর্ব আফ্রিকার প্রথম স্থানীয় আহমদী ডাক্তার হওয়ার সম্মান লাভ করেন। ডাক্তার সাহেব তার যৌবনকালে-ই বয়আত করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। স্কুলজীবন থেকেই ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে অংশ গ্রহণ করতেন। নামধারী ইসলামী

পণ্ডিতদের পক্ষ থেকে আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে অগণিত আপত্তির কারণে তার হৃদয়ে জামা'ত সম্পর্কে জানার কৌতুহল সৃষ্টি হয়। সে যুগেই জামাতের মুবাল্লিগ শেখ আবু তালেব সান্দী সাহেবের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়, যিনি তার আত্মীয়ও ছিলেন। তার সাথে যখন সেসব আপত্তি সম্পর্কে আলোচনা হয় তখন শেখ সাহেব কেবল বিস্তারিতভাবে সেসব মনগড়া আপত্তির উত্তরই প্রদান করেন নি, বরং আহমদীয়া জামা'তের পক্ষ থেকে প্রকাশিত পবিত্র কুরআনের সোয়াহিলী ভাষার অনুবাদ এবং অন্যান্য বই-পুস্তকও তাকে দেখান। এসব পুস্তক অধ্যয়নের পর ডাক্তার সাহেব বয়আত করেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি তার বয়আতের অঙ্গীকার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত পালন করেন। সর্বদা সকল শ্রেণীর লোকদের কাছে ইসলাম ও আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছানোর কাজে রত থাকতেন। তবলীগের জন্য তার হৃদয়ে এক উদ্দীপনা ছিল, যার কারণে আহমদী ও অ-আহমদীদের মাঝে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। প্রায়ই নিজের ব্যাগে করে জামা'তী বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা বাজারে নিয়ে যেতেন এবং বিক্রি করতেন। লোকজন তাকে জিজ্ঞেস করত, (আপনি) ডাক্তার হয়েও এখানে বই-পুস্তক বিক্রি করছেন? এতে তিনি অত্যন্ত আনন্দঘন কণ্ঠে উত্তর দিতেন, আমি যখন হাসপাতালে থাকি তখন দেহের চিকিৎসা করি আর এখন আমি আত্মার চিকিৎসা করছি। এ দু'টি বিষয়কে পৃথক করাও সম্ভব নয় আর এর মধ্যে কোন একটিকে উপেক্ষা করাও উচিত নয়। খিলাফতের প্রতি ছিল (তার) ঐকান্তিক ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক। সন্তানদের ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শে লালনপালন করেছেন। (তাদের) তা'লীম-তরবীয়তের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন; এছাড়া বাড়িতে সন্তানদের নিয়ে নিয়মিত বাজামাত নামাযও পড়তেন। বাড়িতে একটি পাঠাগারও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যেখানে অন্যান্য জ্ঞানগর্ভ বই-পুস্তকের পাশাপাশি জামা'তের বই-পুস্তক রেখেছিলেন। নিজ সন্তানদের আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখার ব্যাপারে নিজেও দোয়া করতেন আর অন্যদেরও (দোয়ার জন্য) অনুরোধ করতেন। জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত থাকতেন। তার সন্তানরাও সবাই জামা'তের ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত আর তাদের পিতার মতোই সৎ প্রকৃতির। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সর্বদা (জামা'তের সাথে) সম্পৃক্ত রাখুন আর তারা তাদের পিতার যাবতীয় দোয়া ও পুণ্য আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নকারী হোক। পাশাপাশি ডাক্তার সাহেবের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা ও কৃপাসুলভ ব্যবহার করুন এবং তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হল, কাদিয়ানের দরবেশ দ্বীন মুহাম্মদ নাঙ্গলী সাহেবের সহধর্মিণী সুগরা বেগম সাহেবার। গত ৬ জানুয়ারি ৮৫ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত হাকীম মুহাম্মদ রমযান সাহেব (রা.)'র কন্যা ছিলেন। তিনি নামায-রোযায় অভ্যস্ত, তাহাজ্জুদগুযার, অতিথিপরায়ণা, ধৈর্যশীলা, কৃতজ্ঞ, পরিশ্রমী, সহানভূতিশীলা এবং আরো অনেক গুণের আধার একজন পুণ্যবতী নারী ছিলেন। খিলাফতের প্রতি ঐকান্তিক ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। (তিনি) অনেক বছর যাবৎ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র সেক্রেটারী খিদমতে খালক হিসেবে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। মরহুমা ওসীয়্যত করেছিলেন। তিনি তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে দু'পুত্র ও দু'কন্যা রেখে গেছেন। তার এক পুত্র বশীর উদ্দীন সাহেব চল্লিশ বছর যাবৎ (জামা'তের) সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। অপর ছেলে মুনীর উদ্দীন (সাহেব) বর্তমানে কাদিয়ানে নিযামে তা'মীরাত বা নির্মাণ বিভাগের অধীনে সেবারত রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা প্রয়াতের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন, তার সন্তানসন্ততিকে তার পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক দিন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হল, শ্রদ্ধেয় চৌধুরী কেরামত উল্লাহ্ সাহেবের; যিনি গত ২৬ ডিসেম্বর ৯৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন; إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

মরহুম হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ঘাটিয়ালিয়াঁ নিবাসী সাহাবী হযরত চৌধুরী শাহ্ দ্বীন সাহেব (রা.)'র পৌত্র ছিলেন, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিয়ালকোট আগমনের সময় বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ

করেছিলেন। মরহুম ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র আর নিঃস্বার্থভাবে (মানুষকে) ভালোবাসতেন। তিনি গরীবের বন্ধু, অভাবীদের সাহায্যকারী এবং সর্বাবস্থায় খোদা তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ একজন নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন।

তার পুত্র সোহেল সাহেব লিখেন, তার মধ্যে অতিথিসেবার গুণটি ছিল অনন্য। আর এর বহিঃপ্রকাশ বিশেষভাবে তখন ঘটতো যখন ওয়াকেফে যিন্দেগীরা জামা'তী সফরে সিন্ধুর বদ্বীনে আসতেন। তিনি ফুরকান ফোর্সেও সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। ১৯৮৩ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল-এর অফিসে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে সেবা প্রদান করেছেন। শুরু থেকেই নিজের বাড়ি জামা'তী অনুষ্ঠানাদির জন্য দিয়ে রেখেছিলেন আর বর্তমান বাড়িতেও একটি অংশ নামায সেন্টারের আদলে বানিয়েছেন। তার মেয়েরাও (জামা'তের) সেবায় নিবেদিত রয়েছেন আর ছেলেও জামা'তের কাজ করছেন। তার দৌহিত্রদের একজন ফরহাদ আহমদ সাহেব জামা'তের মুরব্বী হিসেবে এখানেই যুক্তরাজ্যে (কেন্দ্রীয়) প্রেস এণ্ড মিডিয়া বিভাগে কর্মরত রয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা প্রয়াতের প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন, তার সন্তানসন্ততি এবং বংশধরদেরকে তার সৎকাজগুলো ধরে রাখার তৌফিক দিন।

পরবর্তী জানাযা জার্মানীর চৌধুরী মুনাওয়ার আহমদ খালিদ সাহেবের যিনি গত ২০ আগস্ট ৮৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন; إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

জামা'তের ব্যবস্থাপনার সাথে মরহুমের গভীর সম্পর্ক ছিল। তবলীগি ও তরবিয়তী কার্যক্রমে পূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করতেন। জার্মানীতে বিভিন্ন সময় তিনি প্রেসিডেন্ট এবং জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে (জামাতের) সেবা করেছেন। মজলিসে আনসারুল্লাহ্তেও বিভিন্ন পদে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। এছাড়া পাকিস্তানে থাকাকালে সেখানে তাহরীকে জাদীদের জমি-জিরাতের ম্যানেজার হিসেবেও তার কাজ করার সৌভাগ্য হয়। খিলাফতের সাথে গভীর নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। মরহুম মূসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তার স্ত্রী ছাড়াও পাঁচ পুত্র এবং ছয় কন্যা রয়েছে।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হল, নাসিরা বেগম সাহেবার, যিনি বাংলাদেশের অবসরপ্রাপ্ত মুরব্বী সিলসিলাহ্ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। তিনি গত ২৭ নভেম্বর দিবাগত রাতে ঐশী বিধান অনুযায়ী মৃত্যুবরণ করেন; إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

মরহুমা প্রাক্তন ন্যাশনাল আমীর মৌলভী মুহাম্মদ সাহেবের কন্যা ছিলেন। তিনি নামায-রোযায় অভ্যস্ত, দোয়াগো, অতিথিপরায়ণা, ধৈর্যশীলা এবং কৃতজ্ঞতাপরায়ণা একজন পুণ্যবতী নারী ছিলেন। রমযান মাসে নিয়মিত পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং কুরআন খতম করতেন। এছাড়াও তিনি আরো বহু গুণের আধার ছিলেন এবং পুণ্যে অভ্যস্ত ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার প্রতি ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হল, রফিউদ্দীন বাট সাহেবের, যিনি গত ৬ ডিসেম্বর ৯২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী মৌলভী খায়ের দ্বীন সাহেব (রা.)'র পুত্র ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি যৌবনেই ওসীয়্যত করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। মরহুম বিভিন্ন পদে জামা'তের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি নারওয়াল জেলার বাদ্দোমালহী জামা'তের প্রেসিডেন্ট এবং হালকার আমীরও ছিলেন। ওয়াহ্ ক্যান্ট (সেনানিবাস) জামা'তের প্রেসিডেন্টও ছিলেন। তিনি আল্লাহ্র পথে কারাবন্দী হওয়ারও সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারে চার কন্যা ও এক পুত্র রয়েছে। তার এক জামাতা নাসীম আহমদ সাহেব মুবাল্লিগ হিসেবে নাইজেরিয়াতে সেবা করার সুযোগ পাচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করুন।

আল্লাহ্ তা'লা সকল মরহুমের মর্যাদা উন্নীত করুন এবং নিজ প্রিয়দের সান্নিধ্যে স্থান দিন। যেমনটি আমি বলেছি, নামাযের পর আমি তাদের গায়েবানা জানাযা পড়াব। (ইনশাআল্লাহ্)

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২১, পৃঃ ৫-১১)

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনুদিত)